প্লাবনভূমির মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

বংলাদেশ পানিসম্পদ সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি যা মৎস্য উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এর মধ্যে প্লাবনভূমি ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর ও বিল ১.১৪ লক্ষ হেক্টর। অতীতে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় বিশেষ করে প্লাবনভূমি/ বিলাই ছিল মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। কিন্তু বর্তমানে প্লাবনভূমি/বিল থেকে মাছের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে গেছে। ষাটের দশকের শুরুতেও দেশের মোট মৎস্য উৎপাদানের প্রায় ৯০% পাওয়া যেত অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে, যা কমে গিয়ে বর্তমানে মাত্র ৪৯% এ এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ বহুবিধ। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের চিন্তা না করে মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিতভাবে মাছ আহরণ, অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, শুকনো মৌসুমে নদীতে পানির প্রবাহ হ্রাস, কৃষিজমিতে অতি মাত্রায় সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অবাধে ডিমওয়ালা ও ছোট মাছ নিধন, শুকিয়ে ছেঁকে মাছ ধরা এবং সর্বোপরি পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা। এসব কারণে প্লাবনভূমি/বিলে রুই জাতীয় মাছের প্রবেশ কমে যাওয়ায় মৎস্যখাদ্যে সমৃদ্ধ প্লাবনভূমি মাছ উৎপাদনে এখন আর যথাযথভাবে ব্যবহৃত হতে পারছে না। অথচ রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদ ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্লাবনভূমির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

দেশের যে নিম্নাঞ্চল সাধারণত বর্ষাকালে তলিয়ে যায় এবং ৪-৫ মাস পানিতে নিমজ্জিত থাকে তাকেই প্লাবনভূমি বলে। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিম্নাঞ্চল প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত হয়। মাছের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য প্লাবনভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের চেয়ে অনেক বেশী। বস্তুত প্লাবনভূমি মিঠা পানির অধিকাংশ মাছের চারণ ও প্রজনন ক্ষেত্র। এখানে প্রাকৃতিকভাবে মাছ বৃদ্ধি পায়। প্লাবনভূমি বর্ষা মৌসুমে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তা বিভিন্ন ধরণের আগাছা, কচুরীপানা, ধানক্ষেত ইত্যাদিতে ভরে থাকে। শুকনো মৌসুমে প্লাবনভূমি সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরে ফেলা হয়। কিছু মাছ প্লাবনভূমির গভীর অংশে অর্থাৎ বিলে আশ্রয় নেয় আর কিছু চলে যায় নদীতে।

প্লাবনভূমির রুপান্তর

প্রতি বছর পলি জমে জমে প্লাবনভূমি অগভীর হয়ে যাচ্ছে। নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী থেকে প্লাবনভূমিতে পর্যাপ্ত পানি প্রবেশ করছে না, ফলে প্লাবনভূমির আয়তন কমে যাচ্ছে। রুই জাতীয় মাছ মৌসুমের প্রথম দিকে বৃষ্টির সময় নদীর কিছু কিছু অংশে প্রজনন করে। বর্ষা মেসৈুমে নদীর পানির সাথে সাথে কার্পের পোনা/ রেণু পোনা প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে এবং এখানে ৫-৬ মাস কাটায়। পোনার লালন ও চারণ ক্ষেত্র হিসেবে প্লাবনভূমির আগাছা, উদ্ভিদকণা, প্রাণিজকণা, কচুরীপানা, ধান ইত্যাদি এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। অন্যান্য দেশী মাছও নদী বা প্লাবনভূমিতে প্রজনন করে এবং সেখানে বড় হয়। পরিপক্ক হবার পর এগুলো নদীতে বা প্লাবনভূমির গভীর অংশে চলে যায়। বর্তমানে প্লাবনভূমি ও নদীর মধ্যে চলাচলা পথ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, স্লুইস গেট, সেচ বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারনে নদী থেকে রুই জাতীয় মাছের পোনা/রেণু পোনা প্লাবনভূমিতে আর প্রবেশ করতে পারছে না। ফলে প্লাবনভূমিতে এ মাছের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প

দেশের বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে মৎস্য অধীদপ্তর এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট “তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প” শিরোনামের এই প্রকল্পটি কার্যক্রম যৌথভাবে মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করে চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মোট প্রায় এক লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্লাবনভূমির উন্নয়ন গবেষণা

মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাস থেকেই মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প গবেষণা সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই লক্ষ্যে বগুড়া জেলার সান্তাহারে প্লাবনভূমি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং এর আওতায় নাটোর,

গোপালগঞ্জ ও খুলনায় তিনটি ফিল্ড ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ৭ জন বিজ্ঞানী সহ ৩০ জন কর্মকর্তা কর্মচারী প্লাবনভূমি/বিলের গবেষণা কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্লাবনভূমি/বিলের মৎস্য বিষয়ক গবেষণা বাংলাদেশে এটিই প্রথম এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে একমাত্র তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পই গবেষণা সহায়তা পেয়ে আসাছে। প্লাবনভূমি উন্নয়নের জন্য গবেষণার সঠিক বিষয়স্তু কী হওয়া উচিত তা পূর্ব নির্ধারিত ছিল না। মূলত প্রকল্পের প্রয়োজনে, তাতে পরিবর্তন সাধন করা হয় বা নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের চাহিদানুযায়ী এ যাবৎ নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

- প্লাবনভূমি/বিলের মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ, মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য, জলজ আগাছা, পানি প্রবাহ, বিলের সার্বিক পরিবেশ ইত্যাদির ওপর উপাত্ত সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন বিলে কত ঘনত্বে কী কী মাছের কী পরিমাণ পোনা মজুদ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে তা নিরূপণ করা।
- সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক পোনা মজুদ করে কোন কোন বিলের মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায় সেসব বিল চিহ্নিত করা।
- বিলে মজুদকৃত পোনা বিক্রয়োগ্য আকারে পরিণত হবার আগে তা না ধরেও অন্যান্য প্রজাতির মাছ কী উপায়ে আহরণ করা যায় তা নিরূপণ করা।
- বিলে মজুদের লক্ষ্যে সুস্থ সবল পোনা উৎপাদন ও পরিবহণের কৌশল নির্ধারণ, মজুদকালে কোন রোগবালাই বহন করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা।
- বিলের মাছে কোন প্রকার রোগ দেখা দিলে রোগ সনাক্তকরণ ও রোগের কারণ নিরূপন। বিশেষ করে বিলে ক্ষতরোগের প্রকোপ, ব্যাপকতা, ক্ষতিগ্রস্থ প্রজাতি, ক্ষতরোগে মাছ আক্রান্ত হবরা সময় ইত্যাদি নিরূপণ করা।
- বিলে মজুদকৃত মাছের উৎপাদন সন্তেষজনক কি না তা মূল্যায়ন করা।
- রুই জাতীয় পোনা মজুদের কারণে বিলের অন্যান্য মাছের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়ছে কিনা তা নিরূপণ করা।
- বিলের সার্কি পরিবেশগত দিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যেমে বিলে ছোট জাতের মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবন।
- বিলে অপেক্ষকৃত বড় পোনা মজুদের লক্ষ্যে রুই জাতীয় মাছের আগাম পোনা উৎপাদন মৌসুম উদ্ভাবন।

গবেষণালব্ধ ফলাফল

বিগত ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ২২ টি বিলের ওপর গবেষণা চালানো হয়। এ যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণার ফলাফল নিম্নরূপঃ

বিলের জীবনচক্র

বিল থেকে বিভিন্ন তথ্য/ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এর সার্বিক জীবনচক্র চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; বিশ্রাম পর্যায় (পর্যায়-১), প্রস্তুতিমূলক পর্যায় (পর্যায়-২), বাড়ন্ত পর্যায় (পর্যায়-৩), এবং পচন পর্যায় (পর্যায়-৪) যা সারণি-১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি -১
প্লাবনভূমি/বিলের বার্ষিক জীবনচক্র

পর্যায় বৈশিষ্ট্য	বিশ্রাম (১)	প্রস্তুতিমূলক (২)	বাড়ন্ত (৩)	পচন (৪)
সময়কাল	জানুয়ারী-মার্চ	এপ্রিল- জুন	জুলাই সেপ্টেম্বর	অক্টোবর-ডিসেম্বর
পানি	প্রায় শুকানো	শুধুমাত্র খালে	সমগ্র বিলে	কমতে থাকে
মাছ	আশ্রয়ে থাকে	প্রজননের জন্য প্রস্তুতি	বাড়ন্ত	আশ্রয় খোঁজ
মাছ ধরা	সামান্য	খুবই সামান্য	মোটামুটি	সর্বোচ্চ
ম্যাক্রোফাইটস	শুকানো	গজায়	বাড়ন্ত	পচন
ধান	বোরো বাড়ন্ত	বোরো সংগ্রহ/গজানো	আমন বাড়ন্ত	সংগ্রহ/পচন
কচুরীপানা	বিশ্রাম	গজায়	বাড়ন্ত	পচন

অক্সিজেন পিপিএম	৩-৫	৪-৫	৫-৬	২-৫
পি এইচ	৬.০-৬.৫	৬.৫-৭.০	৬.০-৬.৫	৫.৫-৬.০
ঘোলত্ব (পিপিএম)	৮০-৯০	১০০-২০০	৬০-৮০	৫০-৭০
উদ্ভিকণা সংখ্যা মি.লি.	৫০-৬০	২০-৩০	৬০-৭০	৪০-৫০
প্রাণিজ কণা সংখ্যা লি.	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৫০০	২০০-৩০০

বিশ্রাম পর্যায়ে বিল প্রায় শুকনো থাকে, শুধুমাত্র বিলের মধ্যকার খালে ও কুয়ায় সামান্য পানি থাকে। সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই পর্যায় বিদ্যমান থাকে। এ পার্যায়ে শুধুমাত্র খালে ও কুয়ায় মাছ ধরা সীমিত থাকে।

প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে বিলে জলজ আগাছার বীজ গজায়, মাছের পেটে ডিম আসে এবং বৃষ্টি হলে তাড়াতাড়ি ডিমের পরিপক্কতা আসে। এ পর্যায়টি সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এ সময়ে মাছ কুয়া, খাল ও বিলের গভীর অংশেই সীমিত থাকে এবং এখানে কিছু দেশী মাছের প্রজনন হয়ে থাকে।

বিলের বার্ষিক জীবন চক্রের বাড়ন্ত পর্যায়ই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ে মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে, বিল পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ধানগাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে, সব ধরণের মাছই ডিম দেয়। এই সময়েই মাছ খাবার যোগ্য আকারে পরিণত হয়। সব ধরণের আগাছাই প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিজকণার বংশও বৃদ্ধি পায়। মাছ বাড়ার সাথে সাথে মাছ ধরার কার্যক্রম সমানতলে চলতে থাকে। এই পর্যায়কে বিলের ১ম জলজ পর্যায়ও বালা যেতে পারে।

বিলের জীবনচক্রের সর্বশেষে পচন পর্যায়কে দ্বিতীয় জলজ পর্যায় বলা যেতে পারে যা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই পর্যায়ে জলজ আগাছা ও ধান গাছ পচতে শুরু করে, এবং পানির গুণাগুণের ওপর তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই পর্যাযে বিল থেকে সবচেয়ে বেশী মাছ ধরা হয়। এই পর্যায়ের শেষে বেশীরভাগ বিলের পানি শুকিয়ে যায় এবং অবশিষ্ট মাছ ও পানি বিলের গভীর অংশ, খাল ও কুয়ায় চলে যায়।

প্লাবনভূমি-বিলের শ্রেণীবিভাগ

বিলের ভৌত রাসায়নিক অবস্থা, প্রাকৃতিক খাদ্য, ধান, কচুরীপানা ও অন্যান্য আগাছা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিলগুলোকে ৫টি শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ঘনত্বে পোনা মজুদের পরিমাণ এবং প্রজাতি নির্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে, যা সারণি-২ এ প্রদর্শিত হলো। এই সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের অধীন বিলগুলোতে পোনা মজুদ কার্যক্রম চলছে। বিলের এই শ্রেণীবিভাগ বিল ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে ইতোমধ্যেই সমাদৃত হয়েছে।

শ্রেণী ১: এই শ্রেণীর প্লাবনভূমি/বিলে উন্মুক্ত ধরনের এর তলা সাধারণত সমতল, সচল নালা দিয়ে সাথে নদীর সংযোগ রয়েছে। বর্ষার সময় নদী থেকে পানি এসে এসব বিল প্লাবিত হয় এবং পরবর্তীতে নদীর পানি কমার সাথে সাথে বিলের পানিও কমে যায়।

সারণি -২

প্লাবনভূমির শ্রেণীবিভাগ, মজুদ ঘনত্ব, প্রজাতি বাছাই ও এর শতকরা আনুপাতিক হার

শ্রেণী বৈশিষ্ট্য	১	২	৩	৪	৫
বিলের ধরন	মুক্ত	বদ্ধ	পেরেনিয়াল	বদ্ধ	বদ্ধ
তলার ধরন	সমতল	সমতল	কোণাকৃতি	সমতল	সমতল
ধানক্ষেত	৪০-৫০%	৭০-৮০%	০-৫%	৭০-৮০%	৭০-৮০%
কচুরীপানা	২০-২৫%	৫-১০%	১০-২০%	৫-১০%	৫-১০%
আগাছা	৩০-৪০%	১০-২০%	১০-২০%	১০-২০%	১০-২০%
ঘোলাত্ব পিপিএম	৫০-৬০	৪০-৫০	৬০-৭০	৪০-৫০	৪০-৫০

উদ্ভিদকণা (সংখ্যা-মি.লি)	২৫-৪০	২৫-৪০	৬০-৭০	২৫-৪০	২৫-৪০
প্রাণীকণা (সংখ্যা-লি)	৩০০-৪০০	৩০০-৪০০	৫০০-৬০০	৩০০-৪০০	২০০-৩০০
দ্রবীভূত অক্সিজেন (পিপিএম)	২-৫	২-৫	৪-৭	২০	
পিএইচ	৬.৫-৭.০	৬.৫-৭.০	৬.৫-৭.৫	৬.০-৬.৫	৬.০-৬.৫
মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হে.)	৩০	২০	৩০	২০	১৫
প্রজাতি বাছাই ও এর শতকরা আনুপাতিক হার (%)					
কমন কার্প	৩০	৩০	২৫	২০	৩০
কাতলা	২৫	২৫	২০	৩০	২৫
গ্রাস কার্প	০	০	১০	৫	৫
মৃগেল	১০	১০	১০	৫	৫
রুই	২০	২০	২৫	২৫	২৫
সিলভার কার্প	০	০	৫	৫	০
রাজপুটি	১৫	১৫	৫	১০	১০

শ্রেণী-২: এই শ্রেণীর বিল সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ। বিলের চারদিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ঘেরা এবং এর পানি নিয়ন্ত্রণের স্লুইস গেট রয়েছে। সমতল তলাবিশিষ্ট এসব বিল সাধারণত অগভীর হয়ে থাকে। এ ধরণের বিলের বিশাল এলাকা ধানক্ষেতে বেষ্টিত থাকে।

শ্রেণী ৩: এই শ্রেণীর বিল পেরেনিয়াল বা দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির এবং এর তলা লেক বা বাওড়ের মতো। সাধারণত মরা নদী থেকে এ ধরণের বিলের উৎপত্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিলের সাথে মূল নদীর সরু নালার মাধ্যমে যোগাযোগ থাকে।

শ্রেণী-৪: এই শ্রেণীর বিল প্রায় বদ্ধ প্রকৃতির, তবে এর চারিদিকের বাঁধের কিছু জায়গায় ফাটল থাকায় সেদিক দিয়ে এতে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে। এই বিলের তলা প্রায় সতমল এবং এর কোণাকৃতি অংশে সারা বছরই কিছু পানি থাকে।

শ্রেণী ৫: এই শ্রেণীর বিল প্রায় মুক্ত যা অনেক ক্ষেত্রে পাশ্ববর্তী নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই বিলের তলা প্রায় কোণাকৃতি ধরণের যার এক বা উভয় অংশই ক্ষুদ্রাকৃতির অগভীর অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। পানির স্তরের দ্রুত ওঠানামা এই শ্রেণীর বিলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মাছের পাকস্থলী পরীক্ষা

বিলের মাছ কী ধরণের খাবার খেয়ে থাকে তা নির্ণয়ের জন্য ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে চান্দা (গোপালগঞ্জ) এবং বিএসকেবি খুলনা বিলে মজুদকৃত মাছের পাকস্থলী পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্যের আনুপাতিক হার সারণি -৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি-৩

চান্দা গোপালগঞ্জ এবং বিএসকেবি খুলনা বিলে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে

মজুদকৃত মাছের পাকস্থলী পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্যের আনুপাতিক হার

খাদ্যের ধরণ	উদ্ভিদকণা	প্রাণিজকণা	আগাছা	পেরিফাইটন	বেনথস	অন্যান্য
চান্দা বিল : কাতলা	২৯	১২	২৫	২৬	২	৬
কমন কার্প	১৪	১	১২	১৮	১৯	৩৬
মৃগেল	১৩	২	৬	৮	১৩	৫৮
রুই	২৭	১৫	১৩	২৯	২	১৪
রাজপুটি	২৪	১	২৬	২২	১	২৬
বিএসকেবি বিল: কাতলা	২৪	৬	১৩	২৭	১৮	১২
কমন কার্প	১৯	২	৮	১১	২০	৪০
মৃগেল	৬	২	৬	১৫	৩৮	৩৩
রুই	৩৫	৫	৯	২০	৮	২৩
রাজপুটি	৫৩	২	১১	১৩	১	২০

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, কমন কার্প ও মৃগেল প্রচুর পরিমাণ তলদেশের খাবার ও অনির্দিষ্ট দ্রব্যাদি খেয়ে থাকে এবং এরা নিগেদের মধ্যে খাবার নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। কাতলা, রুই ও রাজপুটির পাকস্থলীতে প্রায় একই ধরণের খাবার পাওয়া গেছে। উদ্ভিদ কণা ছাড়া অন্যান্য খাবার গ্রহনে মজুদকৃত মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কাতলা, রুই এবং রাজপুটি খাদ্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আগাছা ও পেরিফাইটন গ্রহণ করেছে।

বিলে মাছের জন্য ক্ষতিকর যন্ত্রপাতি

বিলে ব্যবহৃত বেড়জাল, ভেসাল ও ডুগাইর প্রচুর পরিমাণ মজুদকৃত পোনা নিধন করেছে। বেড়াজাল মজুদকৃত রুই জাতীয় মাছ এবং অন্যান্য মাছের জন্যও সমান ক্ষতিকর। বেড়াজাল একদিকে যেমন বেআইনীভাবে মাছের পোনা নিধন করছে, তেমনি অন্যান্য ছোট মাছও (অপরিণত ও পরিণত) অবাধে নিধন করছে। এছাড়া বেড়জাল মাছের খাদ্যাভাস, প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র এবং আশ্রয়স্থলও ধ্বংস করে ফেলেছে। মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ছাড়াও বিলের অভ্যন্তরে খাল ও কুয়ার মাছ পানি সেচের মাধ্যমে ব্যাপক হারে নি:স্ব করে ফেলা হচ্ছে যা পরবর্তী বংশরোধের অন্যতম কারণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। মজুদকৃত বিলে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এমন সব মাছ ধারা যন্ত্রপাতি ও তা নিয়ন্ত্রণের সময় পরিধি সারণি -৪ এ প্রদর্শিত হলো।

সারণি-৪

মজুদকৃত বিলে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এমন সব মাছ ধরা যন্ত্রপাতি গিয়ার

মাছ ধরার যন্ত্রপাতি (গিয়ার)	নিয়ন্ত্রণের সময় পরিধি
ফাঁদ (ট্র্যাপ):	
ডুগাইর (১ সে.মি. এর কম ফাঁসের)	জুন থেকে সেপ্টেম্বর
রামনী (১ সে.মি. এর কম ফাঁসের)	জুন থেকে সেপ্টেম্বর
জালঃ	
বেড় জাল	জুন থেকে অক্টোবর
লিফটনেট/ভেসাল	জুন থেকে সেপ্টেম্বর
তার জাল (উদের সাহায্যে মাছ ধরা)	জুন থেকে এপ্রিল
অন্যান্য	
শুকিয়ে মাছ ধরা	ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল

মাছের ক্ষতরোগ

বিলে মাছের মধ্যে মূলত ক্ষতরোগ বেশী দেখা যায় এবং সাধারণত এ রোগ ডিসেম্বরে শুরু হয়ে মার্চ পর্যন্ত থাকে, তবে জানুয়ারীতে এ রোগের সর্বোচ্চ প্রকোপ দেখা যায়। ক্ষতরোগে মজুদকৃত মাছের মধ্যে মৃগেল ও রাজপুটি সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্যান্য মাছের মধ্যে শোল, গজার , টাকি, বাইম, পুটি সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্থ প্রজাতি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যখন তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে ঠিক তখনই ক্ষরোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী থাকে। কারণ কম তাপমাত্রায় মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এছাড়া এ সময়ে মাছের খাবার গ্রহণ খুব কমে যায়, পানি হ্রাস পাওয়ায় পানির গুণাগুণ খারাপ হয়ে পড়ে, ফলে মাছ রোগের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

অন্যান্য ফলাফল

যেসব বিলে পানি অধিক ঘোলা সেসব বিলে মজুদকৃত বৃদ্ধির হার আশানুরূপ নয় এবং এ ধরণের বিলে জলজ আগাছা ও ধানের বিস্তার কম বলে পানির ঘোলাত্ব বেশী। বিলে জলজ খাদ্য কণিকা (উদ্ভিদ ও প্রানিজ প্লাংকটন) পুকুরের তুলনায় কম। ফলে বিলে মাছ এসব প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর খুব একটা নির্ভর করতে পারে না। তবে যেসব বিলে পানি কম ঘোলা এবং যেসব বিলে বেশী সময়ব্যাপী পানি থাকে ঐ ধরণের বিলগুলোতে প্রাকৃতিক খাদ্য তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়।

যেসব বিলে জলজ আগাছা বেশী সেখানে মজুদকৃত মাছের কুতিপয় প্রাকৃতিক খাদ্য যেমন পেরিফাইটন বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। অর্থাৎ জলজ খাদ্য কণিকা কম থাকায় এসব মাছ জলজ নরম উদ্ভিদ খেয়ে বড় হয়। জলজ আগাছা সদ্য ছাড়া পোনা মাছের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে, রাক্ষুসে মাছের হাত থেকে ও বেআইনী আহরণ থেকে পোনাকে রক্ষা করে। এ কারণে বিলের পরিবেশে উদ্ভিদের অধিকতর গুরুত্ব রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

- সিলভার কার্প বিলে মজুদের উপযুক্ত নয়। কমনকার্প ও রাজপুটি খুবই ভাল বাড়ে, কাতলা ও রুই মোটামুটি বাড়ে।
- পর্যবেক্ষণ দেখা গেছে, অতি সামান্য পরিমাণ রুই জাতীয় মাছের পোনা নদী থেকে বিলে প্রবেশ করে। এ থেকে বিলে পোনা মজুদের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাই প্রমানিত হয়।
- তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের বিলে মজুদযোগ্য পোনা মাছের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পোনা প্রোটোজোয়ান পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত। এর জন্য দায়ী দুর্বল নার্সারী ব্যবস্থাপনা, ত্রুটিযুক্ত পরিবহণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রানজিট পুকুর যেখানে বিভিন্ন স্থানের ভাল মন্দ পোনার মিশ্রণ ঘটে। সুষ্ঠু নার্সারী ব্যবস্থাপনা, বিলে এলাকার কাছাকাছি থেকে মজুদের জন্য পোনা প্রাপ্তি এবং উন্নত পরিবহণের মাধ্যমে বিলে সুস্থ সবল পোনা মজুদ সম্ভব। এছাড়া নার্সারী মালিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত জ্ঞান দান করে উন্নত মানের পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।
- বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপানা যেমন হেক্টর প্রতি ১ টন ব্রুড মাছ মিশ্রিতভাবে (সিলভারকার্প ছাড়া) পালন করে ৩৫% প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিয়ে এবং দিনে ২ বার পানি ফ্লাশের মাধ্যমে কাতলা মাছের প্রজনন এক থেকে দেড় মাসে এগিয়ে আনা সম্ভব।
- পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ বিলের পানিই শুকনো মৌসুমে শুকিয়ে যায়। এছাড়া কোন কোন বিলের গভীর অংশে সামান্য পানি থাকলেও সেখান থেকে সব মাছ ছেঁকে ধরে ফেলা হয়। এ কারণে বিলের কিছু কিছু অংশ সংস্কার/পুনঃখনন করে অভায়শ্রম গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অভায়শ্রম গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অভায়শ্রম গড়ে তুলে সংরক্ষণ করতে পারলে তা মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের পোনা মজুদ কর্মসূচী ও মজুদের ফলাফল

দেশের বিস্তর্ণ প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি রুই জাতীয় মাছের মজুদ পুনঃপ্রতিষ্টিত করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯১ সাল থেকে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে পোনা মজুদ কর্মসূচী চলছে। এই কর্মসূচীর আওতায় খুলনা বিভাগে ৩০ হাজার হেক্টর, বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ৩০ হাজার হে. এবং রাজশাহী বিভাগে ৪০ হাজার হে. প্লাবনভূমি/বিলে পোনা মজুদের পরিকল্পনা রয়েছে। প্লাবনভূমিতে মাছের জন্য ব্যাপক পরিমাণ পোনার প্রয়োজন হওয়ায় বেসরকারী পর্যায়ে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই সম্প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়েছে, পোনা উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীগণও উপকৃত হচ্ছেন।

প্রতি হেক্টর প্লাবনভূমি/বিলে ২০-৩০ কেজি হারে পোনা মজুদ করে মাছের উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩০০ কেজি পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরীক্ষমূলকভাবে ১৯৯১ সালে যশোহর জেলার গড়ালিয়া (২০০০হে.) এবং নওগা জেলার হিলনা (২০০০ হে.) বিলে ৭৩ মে. টন মাছের পোনা মজুদ করে মোট ৫০০ মে. টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়। ১৯৯২ -৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে চান্দা ও বিএসকেবি বিল থেকে মাছের উৎপাদন হার এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি বিলে পোনা মজুদের পরিমাণ ও মাছের উৎপাদন সারণি -৫ এ দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯৯৩-৯৪ সালে চান্দা বিল থেকে হেক্টর প্রতি ৭২৮ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যা নিঃসন্দেহের আশাব্যাঞ্জক। এছাড়া ১৯৯৪-৯৫ সালে রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি বিল থেকেও মাছের চমৎ

কার উৎপাদন পাওয়া গেছে।

সারণি-৫

ক) চান্দা (গোপালগঞ্জ) এবং বিএসকেবি (খুলনা) বিলের ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ সালের মজুদ ঘনত্ব ও মাছের উৎপাদন হার।

চান্দা বিল ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ (১ম মজুদ বছর) (২য় মজুদ বছর)		বিএসকেবি বিল ১৯৯২-৯৩ ও ১৯৯৩-৯৪ (১ম মজুদ বছর) (২য় মজুদ বছর)	
মজুদ ঘনত্ব (কেজি/হে.) ১৪	১৪	১৯	২০
উৎপাদন (কেজি/হে.) ৩৭৭	৭২৮	১৮৭	৪৭০
মোট উৎপাদন (মে টন.) ২২৬০	৪৩৬৭	১৪৯৪	২৮১৯

খ) রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি বিলের ১৯৯৪-৯৫ সালের মাছের পোনা মজুদের পরিমাণ ও উৎপাদন

বিল	পোনা মজুদের পরিমাণ (মে. টন)	(উৎপাদন মে. টন) (মে/৯৫ পর্যন্ত)
১। হিলনা (নওগাঁ- বাজশাহী)	৩৭.১৬	৬৫৬
২। উথারাইল (নওগাঁ)	৩৬.৩৬	৫৬৭
৩। বড়বিলা (রংপুর)	১২.১৬	১৮৮
৪। সাদুল্লাপুর কোল (পাবনা)	১৯.৫২	১৮৯

উপসংহার

প্লাবনভূমি/বিলে রুই জাতীয় মাছের পোনার প্রবেশ এবং উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে যাবার প্রেক্ষিতে এখানে পোনা মজুদ কর্মসূচী অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পোনা মজুদের ফলে প্লাবনভূমি থেকে মাছের উৎপাদন ইতোমধ্যেই বেড়েছে যা থেকে স্থানীয় জনগন/ মৎস্যচাষী উপকৃত হচ্ছেন। বিল থেকে স্থায়ীভাবে মাছের আশানুরূপ উৎপাদন পেতে হলে প্রতিটি বিলেই অভয়াশ্রম গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া বিল থেকে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে পোনা মজুদ কর্মসূচীতে ও বিলের মাছ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহন একান্তভাবেই কাম্য। সবশেষে বলা যায়, বিলে পোনা মজুদ করে বিলের সার্বিক প্রতিবেশগত উন্নয়ন ও গবেষণা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিলগুলো থেকে আশানুরূপ মাছের উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে।